

বিপুল অংকের বাজেটে কি উন্নয়ন চুইয়ে পড়ে?

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু:

বিএনপি সরকার তাদের প্রথম প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯.৩৮ লাখ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দসংবলিত বিশাল এক বাজেট। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি। এই বিপুল অর্থের মধ্যে কর রাজস্ব থেকে ৬.০৪ ট্রিলিয়ন টাকা, ০.৯১ ট্রিলিয়ন টাকা আসবে করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে। বাজেটের অবশিষ্ট ২.৪৩ ট্রিলিয়ন টাকার মধ্যে ১.৫৬ ট্রিলিয়ন টাকার উৎস বৈদেশিক ঋণ এবং ১.২৭ ট্রিলিয়ন টাকা আসবে বিভিন্ন দেশীয় উৎস থেকে। প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩.১৬ ট্রিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী উন্নয়ন বাজেটের চেয়ে ৪৭ শতাংশ বেশি।

যেকোনো সরকারের ঘোষিত বাজেট জনগণকে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের রূপরেখা। নতুন রাজনৈতিক সরকারের ঘোষিত বাজেটেও তা প্রতিফলনের চেষ্টায় তারা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার তাদের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে: ‘গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির পথে অগ্রযাত্রা।’

জনগণের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই বাজেটে রয়েছে। কোন সরকারের বাজেটে তা থাকে না? স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৫৫ বছর যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তারা দেশ গড়তে, জনগণের ভাগ্যের উন্নয়ন করতে একই ধরনের অর্থনৈতিক রূপরেখা দিয়েছে, কিন্তু কাক্ষিক্ষত ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল অর্জিত হয়নি।

এরশাদের স্বৈরশাসনমুক্ত বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বব্যাংকের ওই সময়ের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডাইরেক্টর বাংলাদেশের উন্নয়ন স্থবিরতার কারণ ব্যাখ্যা করে এক নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, ‘উন্নয়ন কি চুইয়ে পড়ে?’ কথাটি তিনি রূপক অর্থে বললেও বাংলাদেশের মন্ত্র উন্নয়নের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন আরেক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ভিয়েতনামের গতিশীল উন্নয়নের। ভিয়েতনাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের চার বছর পর নিজেদের দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে দুই দশকের মধ্যে যেভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছিল, বাংলাদেশ তার ধারেকাছেও ছিল না। এখনো নেই। ভিয়েতনামের উন্নয়ন চুইয়ে পড়েনি। তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পেছন ফিরে তাকায়নি।

উন্নয়ন আসলেও টুঁইয়ে পড়ে না। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যেতে যত আগ্রহী, ক্ষমতায় গিয়ে তারা যে বাস্তবতার মুখোমুখি হন, তা অধিক জটিল। প্রতিশ্রুতি পূরণের চেয়ে তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে যেকোনোভাবে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা অথবা দুঃশাসনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে দীর্ঘ বা স্থায়ী করার ফন্দিফিকির করা। দুঃশাসন যত প্রচণ্ড হয়, মানুষের ক্ষোভ তত বাড়ে। সরকার মানুষের ধূমায়মান ক্ষোভ প্রশমন ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করে রাষ্ট্রীয় শক্তি। কিন্তু তাতে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে না।

বাংলাদেশ তার ৫৫ বছর সময়ের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে প্রতিটি শাসকের এমন আচরণ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণের দেশে বিনিয়োগচিত্র হতাশাজনক হবে-এটাই স্বাভাবিক। দুঃশাসন অথবা দুর্বল শাসন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং কাঠামোগত বাধার কারণে বাংলাদেশে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ দুটোই নিরুৎসাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নচিত্র সম্পর্কে তিন দশক আগে যে মন্তব্য করেছিলেন, এখনো বাংলাদেশের উন্নয়ন মুখ খুবড়ে পড়ে আছে।

সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে (এফডিআই) বাংলাদেশ ভিয়েতনামের কত পেছনে, তা উন্নয়নের বুলিতে মুখে ফেনা তোলা রাজনীতিবিদদের জানা উচিত। নীতিনির্ধারকদেরও জানা উচিত। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ সাকল্যে ১.৫ বিলিয়ন ডলার এফডিআই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল, যা ছিল জিডিপির মাত্র ০.৩৩ শতাংশ; অন্যদিকে ভিয়েতনাম এনেছিল এফডিআই ২০.২ বিলিয়ন ডলার, যা ছিল তাদের জিডিপির ৪.২ শতাংশ।

২০২৪-এর পূর্ববর্তী ২৪ বছরে বাংলাদেশে এফডিআই বৃদ্ধির পরিমাণ যেখানে ৫.৪ গুণ ছিল, ওই সময়ে ভিয়েতনামের বৃদ্ধি ছিল ১৫.৬ গুণ। ফেলে আসা এই ২৪ বছরের মধ্যে ১৮ বছরই ক্ষমতায় ছিল দেশের স্বাধীনতার একচেটিয়া অধিকারী হওয়ার দাবিদার, মুক্তিযুদ্ধের সব কৃতিত্বের মালিক-মোক্তার ভারতে আশ্রিত শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমর্থিত ১/১১-এর সরকার।

আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৫ সালে রেকর্ড পরিমাণ এফডিআই দেশে এসেছিল ২.৮৩ বিলিয়ন ডলার। আবারও যদি ভিয়েতনামের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, কেবল দুই বছরে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ভিয়েতনামে মোট ৩৮.৬৭ ডলার এফডিআই এসেছিল। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী রবিন খুদা ভারতের ডেটা সেন্টার প্রকল্পের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে দেশটির বিভিন্ন স্থানে ৩০ বিলিয়ন ডলার

বিনিয়োগ করার ঘোষণা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোষ্ঠিনামা বের করে তার সম্পর্কে কথাবার্তা বলা শুরু হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তার জন্মভূমিতে হোক, অথবা অন্য কোনো দেশে হোক, তিনি তো তার বিনিয়োগ থেকে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে মুনাফা অর্জনের দিকটি আগে দেখবেন, দুনিয়ার কোথায় কোন ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী আছেন, যিনি এমন একটি দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন, যে দেশে বিনিয়োগ করলে মুনাফা আহরণ তো দূরের কথা, রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাসোহারা দিতে হয়, গুল্ডা-মাস্তানদের চা-পানির খরচ দিতে হয়, বিদ্যুৎ থাকে না, যখনতখন ধর্মঘটের কারণে বন্দরে যথাসময়ে উৎপাদিত পণ্য পৌঁছানো যায় না, এমনকি নিরাপত্তাবলয়ে ঘেরা গুলশান আবাসিক এলাকার হলি আর্টিজানের মতো অভিজাত রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে বেঘোরে বিদেশিদের প্রাণ হারানোর ঘটনা ঘটে?

রবিন সাহেব যেহেতু বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, মাটির প্রতি তার টান থাকবে। দেশে নিশ্চয়ই তার আত্মীয়স্বজনও আছেন এবং যেহেতু দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবও আছেন, এটাই স্বাভাবিক। তিনি বিদেশে গিয়ে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও পরিশ্রমে অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে তার বিনিয়োগ থাকলেও এবং তিনি বাংলাদেশে কোনো বিনিয়োগ না করে কেন ভারতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, এ ঘটনা দেখেও যদি বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতির ব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের কোনো হুঁশ না হয়, তাহলে কার কি বলার থাকতে পারে? দেশপ্রেমে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,’ অথবা ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা’ গাওয়া যায়, জীবনও দেওয়া যায়। কিন্তু নিজের অর্থ, এমনকি পিতার অর্থও অন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত দেখতে চায় না। মানুষের এই চরিত্র সম্পর্কে হিব্রু বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘কেউ তার পিতার ঘাতককে ক্ষমা করতে পারে, পিতার অর্থ আত্মসাৎকারীকে ক্ষমা করতে পারে না।’ অতএব রবিন খুদা যদি তার বিনিয়োগ নিরাপদ রাখতে চান, তা দোষণীয় বা নিন্দনীয় হতে পারে না।

রবিন খুদা একমাত্র দৃষ্টান্ত নন। বিপুল বিত্তের মালিক বাংলাদেশি-আমেরিকান ডা. **কালী প্রদীপ চৌধুরীর** বিনিয়োগ আছে ভারতসহ বহু দেশে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তার ‘**কেপিসি গ্রুপ**’-এর বিনিয়োগের ক্ষেত্র পাওয়ার প্ল্যান্ট, বায়োটেকনোলজি, শিক্ষা, হাসপাতাল, হোটেল, রিয়েল এস্টেট, চা-বাগানসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। জন্মভূমি বাংলাদেশেও বিনিয়োগ করতে গিয়েছিলেন এখন থেকে দশ বছর আগে, ‘সোনার বাংলা’ গড়ার কারিগরদের সরকারের আমলে। পূর্বাচলে **৬০ একর জমির ওপর ১৪২ তলাবিশিষ্ট ‘আইকনিক টাওয়ার’** এবং **স্পোর্টস কমপ্লেক্সসহ আরও কিছু স্থাপনায় ৪**

বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক কালী বাবুর আশা পূরণ হয়নি। তিনি এক বুক হতাশা নিয়ে তার ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে বলেছেন, ‘দেশে কিছু করতে চাই, তাই “আইকনিক টাওয়ার” করার ইচ্ছা। এই চেষ্টা করতে গিয়ে আমলাতান্ত্রিক হয়রানির শিকার হয়েছি। বহুবার দেশে গেছি, দেশ থেকে ফিরে এসেছি। জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি (তৎকালীন) ড. মোমেন, অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি আশাবাদী যে আমার স্বপ্নের টাওয়ার বাংলাদেশে নির্মিত হবে।’ বাংলাদেশকেন্দ্রিক আরও কিছু পরিকল্পনা ছিল ডা. কালী প্রদীপ চৌধুরীর। কে জানে এখন তার পরিকল্পনাগুলো কী অবস্থায় আছে।

বিশ্বব্যাংকের ব্যবসা পরিবেশ মূল্যায়ন ‘বি-রেডি (বিজনেস রেডি) সূচক ২০২৪’ অনুযায়ী **৫০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ২৯তম** এবং ‘বি-রেডি সূচক’-এর পূর্বসূরি বিশ্বব্যাংকের ‘ব্যবসা সহজীকরণ’ রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী **১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম।** যে দিকগুলো বিশ্লেষণ করে এই সূচকগুলো নির্ধারণ করা হয়, সেগুলো বাংলাদেশে সুশাসনের অভাব, জনসেবার অনুপস্থিতি, নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোর দুর্বলতা, বিনিয়োগের প্রতিকূল পরিবেশেই সামনে আনে।

বিনিয়োগ পরিস্থিতির এই চিত্র থেকেও আমরা যদি আমাদের দেশের অর্থনীতির চালচিত্র সম্পর্কে ধারণা না করতে পারি এবং পদ্মা সেতু, সুড়ঙ্গপথ, মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ের মতো ব্যয়বহুল স্থাপনা দেখিয়ে জনগণকে ঝুঁদ করে রাখার চেষ্টা করি, তাতে ভালো কিছু হবে না। তা যে হয়নি, তা এসব মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সরকারের দস্তুর ওপর নির্মিত কাচের প্রাসাদ অল্প আঘাতেই খান খান হয়ে যাওয়াই প্রমাণ। অতএব বাজেটে বর্তমান ব্যয় বরাদ্দের কয়েক গুণ বেশি বরাদ্দ করা হলেও দেশ অর্থনৈতিক দুরবস্থার যে খাদে পড়ে আছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

এ পরিস্থিতি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর কবল থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা কি সুখ নিশ্চিত করে? উন্নয়নের গ্যারান্টি দেয়? স্বাধীনতা একটি নীতি, নিজস্ব শাসনের অধিকার, মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা, আইনের শাসন লাভের অধিকার। কোনো স্বাধীন দেশের প্রাথমিক দিনগুলোতে সব ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা কাটিয়ে ওঠা অনেক দেশের জন্যই সহজ ছিল না। কারণ যারা সদ্য স্বাধীন দেশের ক্ষমতায় আসীন হন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা থাকে

না। স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে জনগণ যে পর্বতপ্রমাণ আশা করে, তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কার্যকর কাঠামোর অনুপস্থিতিতে সর্বস্তরে দুর্নীতি ও লুণ্ঠন নিত্যদিনের কর্মসূচিতে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বিধ্বস্ত দেশ গড়তে, ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ এবং গৃহহীন মানুষের মাথার ওপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে সারা বিশ্ব থেকে যা আসছিল, তা হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল। চুরিচামারি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন বুড়ি'র অভিধা দিয়েছিলেন। ওই সময় থেকে বাংলাদেশ পাঁচ দশকের বেশি সময় পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো ভিন্ন আদলে তলাবিহীন বুড়িই রয়ে গেছে।

এই দীর্ঘ সময়ে যারাই যখন ক্ষমতায় এসেছে, তাদের একটি অংশ এবং তাদের আশ্রয়প্রশ্রয়ে থাকা প্রভাবশালী ব্যক্তির ব্যাংকের অর্থ লুট, জাতীয় সম্পদ বিদেশে পাচার করার মাধ্যমে দেশকে ফতুর করে ফেলেছে। এই প্রবণতা বন্ধ না করতে পারলে বছর বছর স্ফীত ব্যয় বরাদ্দসংবলিত বাজেট উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে? উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত হলো : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। এসব নিশ্চিত করার ওপরই দেশ পরিচালনার সাফল্য নির্ভর করে।

(রোববার ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিদিন এ প্রকাশিত)

<https://www.facebook.com/share/p/19MKVUKACH/>